মাথার ওপর একখণ্ড নিশ্চিত নিরাপত্তার নাম শেখ হাসিনা

বীর নিবাসের চাবি পেয়ে কাঁদছিলেন নড়াইলের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সবুর। লোহাগড়া উপজেলার কুমড়ী গ্রামের বসিন্দা তিনি। এখন তাঁর বয়স ৭৫এর বেশি। এই কান্না ছিল আনন্দের। তিনি বলছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের পর জীবনের ঘানি টানতে গিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্যে মাথার নিরাপদ আশ্রয় বানিয়ে দিতে পারেননি। আজ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ তাঁর অসামপ্ত কাজটি করে দিলেন। শেষ জীবনে এমন নিরাপত্তা পেয়ে তিনি তাঁর পরিবার অভিভূত।
ওই দিনের অনুষ্ঠানেই শেখ হাসিনা সারাদেশে প্রায় পাঁচশ’ বীর নিবাসের চাবি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এরইমধ্যে পাঁচ জেলায় পাঁচ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে চাবি হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কাজ চলছে আরও ২৫ হাজার বীর নিবাস তৈরির। সারাদেশে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এরকম ৩০ হাজার ‘বীর নিবাস তৈরি করছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এটা মূলত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্যে শেখ হাসিনার বিশেষ আবাসন প্রকল্প।

এই প্রকল্পের প্রতিটি বাড়ির আয়তন ৭৩২ বর্গফুট। একতলা বাড়িতে দুটি শেবার ঘর একটি বসার ঘর, একটি খাওয়ার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি প্রশস্ত বারান্দা ও দুটি শৌচাগার থাকছে। প্রতিটি বাড়িতে থাকছে একটি উঠান, একটি নলকূপ, গবাদি পশু-হাঁস-মুরগি পালনের আলাদা ব্যবস্থা। প্রতিটি বাড়ি তৈরি করতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪ লাখ ১০ হাজার টাকা।

মুক্তিযোদ্ধাদের এই নিরাপদ আবাসনের মত সারাদেশের গ্রাম গঞ্জ শহরে নগরে চলছে মানুষ নিরাপদ আশ্রয় দেয়ার কর্মযজ্ঞ। এখানে প্রান্তীক ভূমিহীন মানুষ রয়েছেন, রয়েছেন ভিভিন্ন শ্রেণি পেশার কম আয়ের মানুষ। যার যেমন আয় তার জন্যে তেমন করে ভাবা হয়েছে এই প্রকল্পে। বিভিন্ন সময় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় এসেছেন দেশের একজন মানুষও নিরাশ্রয় থাকবে না।

আশ্রয়হীন মানুষের মাথার ওপর নিরাপদ আশ্রয় দেয়ার এই চিন্তা শুরু করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তিনি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরপোড়াগাছা

দেখা যায়নি।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

মমতাময়ী মা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

রাজ্যের সব সমস্যা মাথায় নিয়েও যিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের সকল প্রকার সুখ দুঃখের খবর রাখেন; তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি শুধু একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী নন, সে দেশের জনগণের জন্য একজন মমতাময়ী মা-ও বটে। শিশু থেকে শুরু করে বড়, প্রাপ্তবয়স্ক -বৃদ্ধ সকলকে নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে সহায়তা করে যাচ্ছেন তিনি। কোটি কোটি মানুষকে শিখিয়েছেন আলোকিত জগতের মানে। দারিদ্র্য নিরসন থেকে শুরু করে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, গর্ভবতী ভাতা, জেলে ভাতা-র মতো অসংখ্য অনুদানের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে তাদের দূর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন তিনি।

‘স্বজন হারানোর বেদনা আমি বুঝি। ঘরবাড়ি হারিয়ে যেসব রোহিঙ্গা এখানে এসেছেন, তারা সাময়িক আশ্রয় পাবেন। আপনারা যাতে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারেন,সে ব্যাপারে চেষ্টা চলছে।’- কথাগুলোর মাঝেই নিরীহ রোহিঙ্গাদের জন্য তাঁর মায়া ফুটে ওঠে। ১৯৭৭ সাল থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা ছিলো পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম অত্যাচারিত ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠী। সেনাবাহিনীর জীবনঘাতি আক্রমণ থেকে বাঁচতে মিয়ানমার থেকে উত্তাল সমুদ্র পারি দিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় এসব রোহিঙ্গা। তাদের অনেকেই সমুদ্রের অতলে হারিয়েছেন নিজেদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, কেউ বা একেবারে নিঃস্ব হয়ে এসেছে এ দেশে৷ তাদের না ছিলো থাকার জায়গা, না ছিলো খাবার। শুধুমাত্র কাচা কলা খেয়ে বেচে থাকার মতো মুহুর্তেরও মুখোমুখি হতে হয় তাদেরকে। ১৯৫১ সালের জাতিসংঘের শরণার্থী কনভেনশনে স্বাক্ষরিত দেশ হিসেবে না থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সবসময় তাদের পাশে ছিলো। “১৬ কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারলে ৭ লাখ মানুষকেও খাবার দিতে পারবো”-

উক্তিটির মাঝেই রোহিঙ্গাদের জন্য শেখ হাসিনার মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো তিনি রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে পারেননি। প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে তিনি অর্জন করেন “মাদার অফ হিউম্যানিটি” উপাধি।

ব্রিটিশ শাসনামলের খপ্পরে পড়ে বাংলা সব হারায়। পরিচিত হয় “দারিদ্র্য” নামক শব্দটির সাথে। স্বাভাবিক জীবনযাপন তো দূরের কথা! ভিক্ষুকের চেয়েও মানবেতর জীবন ছিলো বাঙালিদের। ক্ষমতা গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পিতার স্বপ্ন ‘সোনার বাংলা’ বাস্তবায়নে কাজ শুরু করেন। অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর থেকে শুরু করে নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি বৃদ্ধি, ছিন্নমূল- দুঃস্থ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ তারই স্পষ্ট প্রমাণ। এমনকি কোভিড-১৯ এর খরাও খুব দ্রুতই কাটিয়ে উঠেন তিনি। ‘খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২’ অনুযায়ী, বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ ; যেখানে ২০০০ সালের শুরুর দিকে তার পরিমাণ ছিলো ৪৮.৯ শতাংশ । জরিপটিই প্রমাণ করছে বঙ্গবন্ধু কন্যা দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে গরিব, অসহায়,দুঃস্থ মানুষের পাশে কতটুকু দাঁড়িয়েছেন। তিনি ২৫ বছরে মাতৃ মৃত্যুহার ৪৪৭ থেকে ১৬৩ তে আনেন। তিনি সবসময়ই গরিব, অসহায়,দুঃস্থ মানুষের কথা মাথায় রাখতেন। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১,১৩,৫৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন যা মোট বাজেটের ১৬.৭৫ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫৫ শতাংশ। এর মাঝে রয়েছে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি, বিধবা ভাতা কার্যক্রম, দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহয়তা তহবিল, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা,অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট,বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচী,হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে শুরু হওয়া বয়স্ক ভাতায় যেখানে প্রতি ওয়ার্ডের ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলাকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা করে দেওয়া হতো; সেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৭.০১ লক্ষ জন যাদের প্রত্যেকের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা করে। বয়স হয়ে যাওয়ার পর বোঝা হিসেবে গণ্য হওয়া এসব মানুষদের পাশে দাড়িয়ে তাদেরকে সাহস যোগান শেখ হাসিনা। একইভাবে তিনি বিধবা নারীদের কষ্টও লাঘব করেন। সমাজে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের শিকার হওয়া এসব নারীদের জন্য ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে

উন্নয়নে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৯.২৩ লক্ষ টাকা করা হয়। সমাজে মর্যাদা পায় বেদে জনগোষ্ঠী। নদীমাতৃক দেশে জেলেরা প্রধান কর্মজীবী মানুষ হলেও আমাদের দেশে তাদের অবস্থান সবার নিচুতে। অনেক কষ্টের জীবন তাদের। শেখ হাসিনা তাদের জন্যও নির্দিষ্ট একটি ভাতা বরাদ্দ করেন। হিজড়া শব্দটি শুনলেই আমরা কেমন নাক সিটকাই। কিন্তু তারাও তো মানুষ! শেখ হাসিনা তাদেরও নগন্য করে দেখেননি। ২০১২-১৩ অর্থবছরে তাদের জন্য প্রথম ৭ টি জেলায় উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তাদের সহায়তায় ৫.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। আলোর মুখ দেখে ৫,৭৪৫ জন হিজড়াসহ সকল হিজড়া। স্বাভাবিক মানুষের মতো তাদের অধিকারের পক্ষে অনেক আইনী লড়াইও করেছেন তিনি।

চা-শ্রমিক, পোশাক শ্রমিকদের জন্যও তিনি কাজ করে গিয়েছেন। তিনি চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১২০ টাকা থেকে ১৭০ টাকা নির্ধারণ করেন। আনন্দ মিছিলের মাধ্যমে চা শ্রমিক সমাজ শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। তিনি ইমাম-মুয়াজ্জিনদের জন্যও একইভাবে কাজ করেন। জাতীয় স্কেলে বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করেন তিনি। জানা যায়, প্রকল্পের প্রতিটি মসজিদের খতিব জাতীয় বেতন স্কেলের ৮ম গ্রেডে বেতন-ভাতা পাবেন। সে হিসেবে একজন খতিবের মূল বেতন হবে ২৩ হাজার টাকা। গার্মেন্টস শ্রমিকদের অবাসনের লক্ষ্যে তিনি ১২ তলা বিশিষ্ট ভবন তৈরি করা থেকে শুরু করে কোটি টাকার ঋণ প্রকল্প হাতে নেন। তাঁর সবচেয়ে বড় মমতাময়ী অবদান প্রতিবন্ধীদের প্রতি। সমাজের সকল সুবিধাবঞ্চিত শিশু এরা। তাদের না থাকে সকলের সাথে খেলার অধিকার, না থাকে বাঁচার অধিকার। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর তিনি এ বিষয়টিকে এজেন্ডা হিসেবে নিয়েছেন। ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ২রা এপ্রিল অটিজম সচেতনতা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০০৮ সাল থেকে প্রতিবছর পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি এদিন অটিস্টিক শিশুদের সাথে কাটান। তিনি সবসময় তাদের সকল প্রকার সৃজনশীল কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। সকল প্রতিষ্ঠানে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের জন্য ট্রাস্ট গঠন করা,বিভাগীয় পর্যায়ে তাদের বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা, বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, ৬৪ জেলায় ১০৩ টি প্রতিবন্ধী সেবাকেন্দ্র স্থাপনসহ তাদের সুবিধার্থে অনেক কাজ করে গিয়েছেন শেখ হাসিনা। এমনকি শুভেচ্ছা কার্ডের ডিজাইনও বেছে নেন অটিস্টিক শিশুদের থেকেই। এ কাজের জন্য পুরো দেশ তথা বিশ্বে তিনি ও তার কন্যা সায়মা হোসেব পুতুল সকলের প্রশংসা কুড়ান।

একজন প্রশাসক হলেও সবার আগে তিনি একজন মা। নিজের ঘরেও দুইটি সন্তান রয়েছে। তাই তো তিনি প্রশাসন ও লাভ ক্ষতির কথা ভাবার পাশাপাশি দেশের অসহায় জনগণের প্রতি সমান গুরুত্বারোপ করেছেন। ঈদের সময় বিকাশের মাধ্যমে ভাতা নেওয়ার সুবিধা চালু করা থেকে শুরু করে সমাজের সকল স্তরের মানুষের স্বার্থে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন মমতাময়ী এ নারী। তাঁর হাত ধরেই অন্ধকার মানবেতর জীবন থেকে পা বাড়িয়ে আলোর জগৎ দেখে পুরো দেশবাসী। তাই “মাদার অফ হিউম্যানিটি” খেতাব বৃথা যায়নি বললেই চলে। এমন মমতাময়ী মা সকলের ঘরে ঘরে থাকুক।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব ও খনি বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

শেখ হাসিনা: মৃত্যুঞ্জয়ী ধ্রুবতারার উপাখ্যান

একের পর এক আক্রমণ, গ্রেনেড হামলা। অসংখ্য বার হত্যাচেষ্টা। বিশ্বের কোন রাজনীতিবীদ এতোবার হত্যা আক্রমণের শিকার হন নি। রাজনৈতিক জীবনে ২১ বার মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসেছেন শেখ হাসিনা। প্রতিটি হামলাতেই অনেক মানুষ নিহত হয়েছেন, আহতের সংখ্যা অগণিত।

১৯৮১ থেকে ১৯৯১ সাল, এই দশ বছরে শেখ হাসিনাকে মোট তিনবার হত্যার চেষ্টা করা হয়। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে প্রথম সরকার গঠনের পর আরো তিনবার শেখ হাসিনার উপর হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হয়। এমনকি ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়েও হত্যাচেষ্টা চলে। ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়েও শেখ হাসিনাই মূল টার্গেট বিরোধী শক্তির।
১৯৮৮ সালে এরশাদ সরকারের আমলে চট্টগ্রামের লালদীঘি দিয়ে শুরু হয় শেখ হাসিনার উপর হত্যার উদ্দেশ্যে প্রথম আক্রমণ । ১৯৮৮ সালে ২৪ই জানুয়ারি পতেঙ্গা বিমানবন্দরে নেমে একটি সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশে যোগ দিতে লালদীঘিতে যাচ্ছিলেন শেখ হাসিনা। পথে সসস্ত্র

আর্জেস গ্রেনেড। মূল টার্গেট আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা।

২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা দায়ের করা হয় ২০০৪ সালে। কিন্তু ২০০৫ সালে মামলাটি নিয়ে জজ মিয়া নাটক মঞ্চস্থ করে বিএনপি - জামায়াত জোট। রাজনৈতিক্ পটপরিবর্তনের পর মামলা গতি পায় ২০০৭ সালে। ২০০৮ এ অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে অধিকতর তদন্তের পর ২০১১ সালে সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। ২০১২ সাল থেকে আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয় মামলার। যুক্তিতর্ক শুরু হয় ২০১৭ সালে, আর ২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর এই মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। বহুল আলোচিত এই মামলার রায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ১৯ জনকে। বিচারের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১৯ জনের অন্যতম বিএনপি আমলের সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু, ডিজিএফআই এর সাবেক মহাপরিচালক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী ও এনএসআই এর সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুর রহিম। তারেক রহমান ও হারিছ চৌধুরীসহ ১৭ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আদালত।

ওয়ান-ইলেভেন পরবর্তী সময়ে কারাবন্দী থাকা অবস্থায় খাবারে বিষ প্রয়োগ করে শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ঐ খাবার খেয়ে তাঁর চোখ-মুখ ফুলে গিয়েছিলো এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ২০০৯ সালের ২৭ জুন রাজধানীতে এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের তৎকালীন সংসদ উপনেতা সৈয়দ সাজেদা চৌধুরী এ তথ্যের নিশ্চয়তা দিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য দেন। ১১ মাস কারাগারে থাকার পর ২০০৮ সালের ১১ জুন মুক্তি পান বঙ্গকন্যা শেখ হাসিনা।

শ্রীলঙ্কার একটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্র সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করেছিল শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য। ২০১১ সালের ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যা করার লক্ষ্যে একটি সামরিক অভ্যুত্থান চেষ্টার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যা পরে ব্যর্থ হয়ে যায়। ২০১৪ সালের শেষদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র ও অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার কথা স্বীকার করেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতার জঙ্গি শাহানুর আলম ওরফে ডাক্তার

২০১৫ সালের ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাওয়ার পথে কারওরান বাজারে তার গাড়িবহরে বোমা হামলা চালানোর চেষ্টা চালায় জামা’আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ জঙ্গিগোষ্ঠী। ২০১৬ সালের জুনে শেখ

হাসিনাকে বহনকারী বিমান হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের রানওয়েতে ধাতব পদার্থের উপস্থিতি থাকায় নামতে গিয়ে আবার ওপরে উঠে যায়। ধারণা করা হয়েছিল ওই বস্তুর আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হবে তার বিমান। ২০১৬ সালের ২৭ নভেম্বর সরকারি সফরে হাঙ্গেরি যাওয়ার পথে বিমানের নাট ঢিল করে রাখা হয়েছিল, যদিও বিষয়টিকে কিছুটা গোপনে রাখা হয়েছিল তখন কিন্তু তাকে হত্যার পরিকল্পনায় এমনটা হয়েছিল বলে ধারণা।

২০১৭ সালেও শোকের মাসে ধানমন্ডি-৩২ নম্বরে শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল জঙ্গিরা। বারবার হামলার পরও বুলেট-বোমা আর কূটচালের শত বাধা ডিঙিয়ে যিনি বাংলাদেশকে টেনে তুলছেন খাদের কিনার থেকে সমৃদ্ধির পথে।

আমাদের একজন সাহসী শেখ হাসিনা আছেন

আমেরিকা চাইলে যেকোনও দেশের ক্ষমতা উল্টাতে-পাল্টাতে পারে। উন্নয়নশীল দেশের জন্য সেটি নস্যি। যেদেশ রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিবর্তন করতে পারে, সেদেশের বিরুদ্ধে কিছু বলা মানেই নিজের বিপদ। যেন-তেন প্রকারে ক্ষমতায় থাকতে হলে আমেরিকাকে খুশি করে চলা ছাড়া কোনো পথ নেই। কিন্তু এটা জেনেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেন যুক্তরাষ্ট্রের সব কথাতেই হ্যাঁ তে হ্যাঁ মেলান নি। চোখে চোখ রেখে জবাব দিয়েছেন। স্যাংশন বা ভিসানীতি কোন কিছুতেই পরোয়া করেন না তিনি।

কেউ অন্যায় করলে মুখ বুজে সহ্য করেন না বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। জনসম্মুখে তা প্রকাশ্যে আনতে কুণ্ঠা বোধ করেন না তিনি। ২০০১ সালের ২০ মার্চ আমেরিকার প্রথম কোনো প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন বিল ক্লিনটন। ক্লিনটনের কাছ থেকে গ্যাস বিক্রির প্রস্তাব পাওয়ার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমি বলেছিলাম, আমাদের দেশে কত গ্যাস আছে, আমরা এখনো জানি না। আমাদের দেশের সামান্য কয়েক পার্সেন্ট মানুষ এই গ্যাস সুবিধাটা পাচ্ছে।

কতটা গ্যাস আছে এটা না জানলে; আমরা কীভাবে আপনাদের ওয়াদা দেবো যে, আমি ক্ষমতায় গেলে গ্যাস বিক্রি করবো।’

২০০১ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে বিএনপি। পরবর্তীতে আন্দোলনের মুখে তত্ত্ববধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা দিয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় দলটি। তত্ত্ববধায়ক সরকারের অধীনে ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বরের নির্বাচনে ভরাডুবি হয় বিএনপির। দলটি পেয়েছিল মাত্র ৩০টি আসন। আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় হয়। বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের ইতিহাসে ২০০৮ সালের নির্বাচনটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বীকৃতি পেয়েছিল। ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিএনপি অংশ না নিলেও যথারীতি নির্বাচনে হয়। সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার বিষয়ে অনড় থাকা বিএনপি ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনেই অংশ নেয়। বিএনপি পায় মাত্র পাঁচটি আসন৷

আবারও দরজায় কড়া নাড়ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেশ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আলোচনার কেন্দ্র বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন। তাই ঘুরে ফিরে আসছে বিদেশি হস্তক্ষেপের বিষয়। ২০০১ সালের মতো এবারও কী কোনো দেশকে মুচলেকা দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে যেতে হবে? এই প্রশ্ন আরও জড়ালো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক মন্তব্যকে ঘিরে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘আমি ক্ষমতায় থাকি তারা (যুক্তরাষ্ট্র) হয়তো চায় না, আমি বাংলাদেশের জন্য যেসব উন্নতি করেছি, সেটা তারা (যুক্তরাষ্ট্র) হয়তো গ্রহণ করতে পারছে না। এটা আমার অনুভূতি।’ বিবিসিকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। গত ১৫ মে রাতে বিবিসির বাংলা বিভাগ তা প্রচার করে।

গেল ১৫ মে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে উঠে আসে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গ। শেখ হাসিনা বলেন, ‘আমাদের কী কারণে স্যাংশন দিল? যাদের দিয়ে আমরা সন্ত্রাস দূর করলাম, জঙ্গি দূর করলাম, তাদের ওপরে? হোলি আর্টিজানে যারা হামলা করেছিল, তাদের দমন করে মানুষ জীবিত উদ্ধার করতে কিন্তু ২৪ ঘণ্টাও লাগেনি। এরপরেও আরও কোন ঘটনা কেউ ঘটাতে পারেনি। এরপরেও স্যাংশনটা কিসের জন্য?’
ভিসানীতি প্রয়োগ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি নিয়ে বাংলাদেশের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

ফেব্রুয়ারি ও নভেম্বরে তাঁকে পুনরায় গৃহবন্দি করা হয়। ‘৮৫-এর মার্চে তাকে তিন মাস গৃহবন্দি রাখা হয়। ‘৮৮-এর ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামে শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর গাড়িবহরে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ‘৯৪-এ পাবনার ঈশ্বরদী রেলস্টেশনের উত্তর প্রান্তে বন্দুকধারীরা তার কামরা লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। ২০০৪-এর ২১ আগস্ট শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা করা হয়। শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য ১৯ বার হামলা হয়েছে। কিন্তু কোনো কিছুতেই ভয় করেননি তিনি, অন্যায়ের কাছে মাথানত করেননি।

সততা আর জনতার বিশ্বাস যেকোনো নেতাকে সাহসী করে। অন্যায় না করলে অন্যতে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। মানুষের মঙ্গল করলে অবশ্যই দেশবাসী তার প্রতিদান দেবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাই জনগণের উপর ভরসা রাখছেন। তাই তিনি বলেছেন, ‘জনগণ ভোট দিলে আছি, না দিলে নাই। এ নিয়ে আফসোস নাই।’ প্রধানমন্ত্রী যেমন আমাদের ওপর ভরসা রাখছেন, তেমনি তাঁর ওপর আমাদেরই ভরসা আছে। শুভ জন্মদিন মানবতার আলোকবর্তিকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য পরিসংখ্যান

আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছিয়াত্তর বছর বয়স পূর্ণ করবেন। এটি কি শুধুই একটি সংখ্যা? এর মধ্যে কি কোন মহত্ব নেই? আমাদের মত সাধারন মানুষের ক্ষেত্রে বয়স বাড়লেও কোন সতুন অর্জন হয় না বলেই তা একটি সংখ্যামাত্র। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মত মানুষের ক্ষেত্রে সেটি যে একটি সংখ্যা নয় তা পরিসংখ্যান। তা যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, ওয়েবসাইট এবং সকল মিডিয়ার আশ্রয় নিলাম। উইকিপিডিয়া ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ওয়েবসাইটেও সকল তথ্য না থাকায় সকল তথ্য সন্নিবেশিত করতে পেরেছি কিনা জানি না। যেটুকু পেরেছি, সেই পরিসংখ্যানই বলবে তিনি কত বড় মহিরুহ বাংলাদেশের। এই এত বছরের জীবনে তিনি অনেক চড়াই

উৎরায় পার হয়েছেন।

রাজনৈতিক অনেক ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে তৈরী হয়েছেন একজন শক্ত মানুষে। তার প্রমাণও তিনি রেখেছেন তার বিভিন্ন পদক প্রাপ্তী ও অর্জনের মধ্য দিয়ে। সমালোচকরা বলতেই পারেন তিনি ক্ষমতায় ছিলেন বলেই পেয়েছেন। কিন্তু না, সমালোচকদের মুখে ছাই দিয়ে যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না তখনও পদক পেয়েছেন। কমবেশী প্রায় অর্ধশতাধিক পদকের নাম পাওয়া যায়। পদকের পরিসংখ্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে আমাদের কি ধারনা দেয়? কতটা পরিপক্ক রাজনীতিবিদ তিনি? একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে গণতন্ত, শান্তি, দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত খাতে উন্নয়নের জন্য বহু পদক ও সম্মাননা পেয়েছেন।

১ম মেয়াদে পদক প্রাপ্তি:

১৯৯৬সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত অনেক পুরস্কার পান। তার মধ্যে অন্যতম হল ১৯৯৮ সালে পার্বত্য শান্তি চুক্তির জন্য ইউনেস্কো প্রধানমন্ত্রীকে “হোফে বোয়ানী” শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করেন। এছাড়াও এই সময়ে “নেতাজি শান্তি পুরস্কার” (১৯৯৭), যুক্তরাজ্যের অ্যালবার্টা ডান্ডি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মান সূচক “ডক্টর অব লিবারেল আর্টস” (১৯৯৭) অন্যতম। ১৯৯৭ সালে লায়ন্স ক্লাবসমূহের আন্তর্জাতিক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক “রাষ্ট্রপ্রধান পদক” এবং রোটারী ইন্টারন্যাশনালের রোটারী ফাউন্ডেশন কর্তৃক “পল হ্যারিস ফেলো” নির্বাচিত করে। ১৯৯৮ সালে নরওয়েতে মহাত্মা গান্ধী ফাউন্ডেশন উনাকে “ মহাত্মা গান্ধী” পদক প্রদান করেন। ১৯৯৯ সালে ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় উনাকে “দেশিকোত্তমা” ডিগ্রী প্রদান করেন একই বছরে তাঁকে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক “ডক্টর অব ল” ডিগ্রী প্রদান করেন। ১৯৯৯ বাংলাদেশের ক্ষুদার বিরুদ্ধে আন্দোলনের স্বীকৃতিস্বরুপ জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কর্তৃক “সেরেস পদক” লাভ করেন। ২০০০ সালে ব্রাসেলসের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় তাকে “ডক্টর অব তানরিস কাসিয়া” প্রদান করে। একই সময়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবাধিকারে অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকন উইমেন্স কলেজ “পার্ল এস বাক” পদক প্রদান করে। একই সময়ে তিনি আফ্রো এশিয়ান ল’ ইয়ার্স ফেডারেশন কর্তৃক “পার্সন অব দ্য ইয়ার” নির্বাচিত হন।

ক্ষমতাহীন অবস্থায় পদকপ্রাপ্ত:

২০০১ সালে তিনি বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁকে সম্মানসূচক “ডক্টর অব সায়েন্স” ডিগ্রী প্রদান করা হয়। গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তির পক্ষে অবদান রাখার জন্য শেখ হাসিনাকে ২০০৫ সালে পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি অব রাশিয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানসূচক “ডক্টর অব লজ” ডিগ্রী প্রদান করেন।

২য় মেয়াদে পদক প্রাপ্তি:

২০১০ সালে ১২ জানুয়ারী “ইন্দ্রিরা গান্ধী শান্তি পদক” একই বছর বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুহার কমানোতে অবদান স্বরুপ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-৪ পূরনে জাতিসংঘ কর্তৃক “মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল” পুরস্কারপ্রাপ্ত হন। একই বছর তিনি আন্তর্জাতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। ২০১১ সালে বাংলা একাডেমির সম্মাননা সূচক ফেলোশিপ পান, একই বছর গণতন্ত্র সুসংহতকরনে প্রচেষ্টা ও নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখার জন্য প্যারিসের ডাউফিন ইউনিভার্সিটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ স্বর্ণপদক ও ডিপ্লোমা পুরস্কার প্রদান করে। একই বছর আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন, সাউথ, সাউথ নিউজ ও জাতিসংঘের আফ্রিকা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কমিশন যৌথভাবে স্বাস্থ্যখাতে যুগান্তকারী সাফল্য অর্জনের জন্য “সাউথ সাউথ” পুরস্কার প্রদান করে। একই সালে তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্বারে দূরদর্শী নেতৃত্ব, সুশাসন, মানবাধিকার রক্ষার জন্য ইংল্যান্ডের হাউজ অব কমন্স প্রধানমন্ত্রীকে “গ্লোবাল ডাইভারসিটি অ্যাওয়ার্ড” প্রদান করেন। পরবর্তী বছরে তিনি ইউনেস্কো “কালচারাল ডাইভারসিটি পদক” প্রাপ্ত হন। একই বছরে তিনি বন ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের জন্য ইকুয়েটর পুরস্কার, ওয়াঙ্গারি মাথাই পুরস্কার এবং আর্থ কেয়ার পুরস্কার অর্জন করেন। টীকাদান কর্মসূচীতে অসামান্য অবদানের জন্য ২০১২ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে গাভি (এঅঠও) পুরস্কার দেওয়া হয়। একই বছর শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার জন্য ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে সম্মানসূচক “ডিলিট” ডিগ্রী প্রদান করেন। ২০১৩ সালে খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য “সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড, ২০১৩” প্রাপ্ত হন। সরকারের বিশেষ প্রকল্প “একটি বাড়ি একটি খামার” জন্য ভারত হতে “সাউথ এশিয়া ও এশিয়া প্যাসিফিক ম্যানহাটন অ্যাওয়ার্ড ২০১৩” পুরস্কার লাভ করেন।

৩য় মেয়াদে পদক প্রাপ্তি:

২০১৪ সালে খাদ্য উৎপাদন ও তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রীকে সম্মাননা সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ২০১৪ সালে নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নে অবদানের জন্য ইউনেস্কো “শান্তি বৃক্ষ” পুরস্কার পান। একই সময় ডিজিটাল ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অগ্রগতি ও শিক্ষার প্রসারে অবদাননের জন্য “সাউথ সাউথ কো অপারেশন ভিশনারী অ্যাওয়ার্ড” পান। একই বছর সমুদ্রসীমা জয়ের জন্য ‘সাউথ সাউথ পুরস্কার লাভ করেণ। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আইসিটির ব্যবহার জন্য “আইসিটি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড” পান। এ বছরই জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পুরস্কার “চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ” লাভ করেন। ২০১৫ সালে রাজনৈীতিতে নারী পুরুষের বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনে “উইমেন ইন পার্লামেন্ট গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড” দেওয়া হয়। ২০১৬ সালে শেখ হাসিনাকে ‘এজেন্ট অব চেঞ্জ’ পুরস্কার ও ‘প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন’ প্রদান করা হয় নারি ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য, একই বছর দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেডক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন। ২০১৮ সালে রোহিঙ্গা সঙ্কটের সমাধানে দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে দাতব্য সংগঠন ‘গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশন’ এর পরিচালনা পর্ষদ শেখ হাসিনাকে ‘স্পেশাল রিকগনিশন ফর আউটস্টান্ডিং লিডারশিপ’ অ্যাওয়ার্ড পান। একই বছর রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় প্রদান করার ইন্টারপ্রেস সার্ভিস নিউজ এজেন্সি প্রধানমন্ত্রীকে “ইন্টারন্যাশনাল এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড” প্রাপ্ত হন। ঐ একিই বছরে প্রধানমন্ত্রী ভারতের কবি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ‘ডক্টর অব লিটারেচার (ডি-লিট) ডিগ্রী লাভ করেন।

৪র্থ মেয়াদে পদক প্রাপ্তি:

২০১৯ সালে চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালে নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান রাখায় ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়া উইমেন ‘লাইফ টাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড’ পান। একই বছরে নারী ও শিশু কল্যাণে অবদান স্বরুপ ভারতের ‘ড. কামাল স্মৃতি

ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯’ প্রদান করা হয়। এই-সময়ই বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচিতে ব্যাপক সফলতার জন্য “ভ্যাক্সিন হিরো” উপাধি পান। তরুনদের দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ‘চাম্পিয়ন ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ’ সম্মাননায় ভূষিত হন। একই বছর আঞ্চলিক শান্তি ও সমৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখায় কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি ‘ঠাকুর শান্তি পুরস্কার-২০১৮’ প্রদান করে। ২০২১ সালে জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন নেটওয়ার্ক তাকে “এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার” প্রদান করে। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচী প্রনয়ন ও তা বাস্তবায়নে নেতৃত্বদানে ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে অসামান্ন অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ “উইটসা এমিনেন্ট পারসনস অ্যাওয়ার্ড ২০২১” এ ভূষিত হয়েছেন।

উপাধি সমূহ:

শেখ হাসিনাকে দেওয়া বিশ্ববাসীর উপাধিসমূহ যুক্তরাস্ট্রভিত্তিক প্রভাবশালী বিজনেস ম্যাগাজিন ‘ফোর্বস’ উনাকে ‘লেডি অব ঢাকা’ উপাধি দেন। রোহিঙ্গা ইসুতে উনাকে ব্রিটিশ মিডিয়া “মাদার অব হিউম্যানিটি” উপাধি প্রদান করেন। মিসরের রাস্ট্রদূত উনাকে “ক্যারিশম্যাটিক লিডার” বলেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সংবাদপত্র তাকে “প্রাচের নতুন তারকা” উপাধি দেন। এছাড়াও “জোয়ান অব আর্ক”, “বিশ্ব শান্তির দূত”, “বিশ্ব মানবতার বিবেক”, “বিশ্ব মানবাতার আলোক বর্তিকা”, মানবিক বিশ্বের প্রধান নেতা”, কতশত উপাধি।

ক্ষমতাধর হিসাবে অবস্থান:

২০১৫ ফোর্বস এ প্রথম ১০০ জন সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর নারীর দধ্যে ৫৯তম স্থান অর্জন। শেখ হাসিনা ২০১১ সালে বিশ্বের সেরা প্রভাবশালী নারী নেতাদের তালিকায় ৭ম স্থানে ছিলেন। ২০১০ সালে নিউ ইয়ার্ক টাইমস সাময়িকী অনলাইনে জরিপে তিনি বিশ্বের সেরা দশ ক্ষমতাধর নারীদের মধ্যে ৬ষ্ঠ স্থানে ছিল। ২০১৪ সালে এই তালিকায় শেখ হাসিনার অবস্থান ছিল ৪৭তম।

গণমাধ্যমের তথ্য, ওয়েবসাইট এবং সকল ইন্টারনেট তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় অর্ধ শতাধিক খেতাব ও উপাধি প্রাপ্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। উনার অর্জনসমূহ যদি সারংশ করা হয় তবে দেখা যায় বাংলাদেশের অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শিশু ও নারী অধিকার ও

উন্নয়নে উনার কি অসামান্য অবদান। মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরনের কি বিশেষ অবদান গত টানা তিনবারের ক্ষমতায়নে। সারাবিশ্ব যার স্বীকৃতি দিয়ে আসছে টানা পনের বছর। যে উন্নয়নকে ছোট করে দেখার কত অপচেষ্টা ভেতরে ও বাইরে থেকে। মাহাথির মোহাম্মদ দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিলেন মালয়েশিয়াতে তখন কাওকে বলতে শুনিনি গণতন্ত্র হত্যা হচ্ছে। সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় ছিলেন দীর্ঘদিন। সেই সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর দেখেছি তার প্রতি মানুষের ঘৃণা। এখন শুনি ইরাকের মানুষের নাকি সাদ্দাম হোসেনের জন্য হাহাকার। সত্য মিথ্যা জানি না। রাজনীতি সচেতন মানুষ নই। পুতিনকে কেও বলেন না স্বৈরাচার। শুধু গণতন্ত্র খুজি এই গরীবদেশে। যেখানে সামান্য অর্থের বিনিময়েও গণতন্ত্র কেনা যায়। নিরষ্কুশ গণতন্ত্রই যদি একটি দেশের উন্নয়ন এনে দিতে পারত তবে সিঙ্গাপুর এত বড় ধনী দেশ হতে পারত না। মালয়েশিয়া ধনী দেশ হত না। তবুও এদেশের মানুষ গণতন্ত্রকামী। তাই সঠিক মূল্যয়নেই হোক বাংলাদেশের ভবিষ্যত নির্ধারন। চাঁদেরও কলংক আছে। টানা পনের বছর একটি দল ক্ষমতায়। তাই ভুলত্রুটিও আছে। সেটি ধরে দেওয়ার জন্য একটি শক্ত বিরোধীদলও হয়ত এই মূহুর্তে প্রয়োজন একটি উন্নত বাংলাদেশের জন্য। তবে এখন পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিকল্প কেউ তৈরী হয় নাই যতই সমালোচকরা উনার সমালোচনা করুক না কেন।

লেখক: লেখক ও গবেষক। চেয়ারম্যান, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

নানামুখী চ্যালেঞ্জে জয়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মুক্তিযুদ্ধের পর মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে বলেছিল ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’। সেই বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে উদীয়মান অর্থনীতির রোল মডেল। যাঁর নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশের এই বিস্ময়কর উত্থান, তিনি বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার পথচলার এ দীর্ঘ সময় কখনোই সহজ ছিল না। ২১ বার তাঁকে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে স্বাধীনতাবিরোধীরা। তাছাড়া

নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে শক্ত হাতে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে আজও বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।

১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর দেশে ফেরাই ছিল শেখ হাসিনার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তৎকালীন স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরতে বাধা দেয়। ফলে রাজনৈতিক আশ্রয়ে বাধ্য হয়ে ভারতে অবস্থান করেন শেখ হাসিনা। কিন্তু বাংলার মানুষের ভালোবাসায় তৈরি হয়েছে শেখ হাসিনার সাহসের পাটাতন। পরবর্তীতে সামরিক সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি ফিরে আসেন স্বদেশে। মুখোমুখি হন স্বৈরাশসকের।

১৯৭৭ সালে ভারত সফরের সময় জিয়াউর রহমান শেখ হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় না দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন তৎকালীন ভারত সরকারকে। ভারতের প্রভাবশালী দৈনিক ইন্ডিয়ান টাইমসে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সে সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭৫-৮১ ছয় বছর বিদেশে নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে অবশেষে ১৯৮১ সালের ১৭ মে সকল রক্তচক্ষুকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন। শুরু করেন বাংলার মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার আন্দোলন।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল আওয়ামী লীগ। অনেকেই আওয়ামী লীগ ছেড়ে মোশতাকের মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিল সে সময়। সারাদেশে স্বৈরশাসক জিয়ার অত্যাচার নিপীড়নে ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছিল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। সে অবস্থা থেকে দলের পুনর্গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন শেখ হাসিনা। কয়েক বছরের মধ্যেই শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আবার ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শুরু হয় আওয়ামী লীগের পুনর্জাগরণ।

সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের পতনের পর শুরু হয় স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনামল, চলে ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। স্বৈরাশাসক হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ এসময় দেশের গণতন্ত্রের টুটি চেপে ধরে, পূর্ববর্তী সেনাশাসক জিয়ার মতই একচেটিয়া শাসনব্যবস্থায় দেশ পরিচালনা করতে থাকে। কিন্তু শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের মানুষকে সাথে নিয়ে তীব্র আন্দোলনের মুখে পিছু হটতে শুরু করে এরশাদ। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নানামুখী আন্দোলনের মুখে পতন ঘটে স্বৈরাচার এরশাদের শাসনব্যবস্থা। পুনরুদ্ধার হয় গণতন্ত্রের। এজন্যই তাঁকে বলা হয় ‘গণতন্ত্রের মানসকন্যা’।

ব্যাখ্যা দিয়ে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করেছে সাম্প্রদায়িক অপগোষ্ঠী। রামু, নাসিরনগর, কুমিল্লা, রংপুরের সাম্প্রদায়িক আস্ফালন এর প্রকৃত উদাহরণ। কিন্তু শেখ হাসিনা শক্তহাতে এ সাম্প্রদায়িক আস্ফালন বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীসহ সর্বস্তরের সর্বধর্মের মানুষের সহায়তায় সাম্প্রদায়িকতা বন্ধের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। প্রতিটি ঘটনায় দোষীদের বিচারের আওতায় এনে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ গড়ার কাজ করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে।

শুধু তাই নয়, করোনার কারণে বিশ্ব অর্থনীতি যখন ধুঁকছিল, তখনও বাংলাদেশ রেকর্ড ৫ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। প্রয়োজনীয় সময়ে লকডাউন ঘোষণা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, টিকা আমদানি ও তা সঠিকভাবে প্রয়োগ, করোনা যুদ্ধে ফ্রন্টলাইন যোদ্ধাদের জন্য পিপিই-মাস্কসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী নিশ্চিত করা; টেস্টিং কিট আমদানি, দেশের বিভিন্ন স্থানে ল্যাব স্থাপন, স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শের জন্য ৩টি হটলাইন (১৬২৬৩; ৩৩৩ ও ১০৬৫৫) চালুসহ প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপই সঠিক সময়ে গ্রহণ করেছিলেন শেখ হাসিনা। তাঁর গৃহীত বাস্তবসম্মত নানা পদেক্ষপের কারণেই বাংলাদেশ করোনা মোকাবিলায় বিশ্বে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বর্তমানে ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, ৪২৩টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, ৬৬টি ত্রাণ গুদাম, ২৬৯২ কি.মি. মাটির রাস্তা এইচবিবিকরণ, ৬৪৯১টি সেতু/কালভার্ট এবং ৫৫০টি মুজিব কিল্লা সংস্কার ও নির্মাণ করা হয়েছে ।

আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ দক্ষতার সাথে সামলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশের বিরোধ ছিল। শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে কোনরকম রক্তপাত ছাড়াই সমুদ্রসীমা বিরোধ সমাধান করেন। একই সাথে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ কিলোমিটার সমুদ্রসীমার ওপর সার্বভৌম অধিকার ছিনিয়ে আনেন। যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। চীন ও ভারতের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থাকলেও শেখ হাসিনা অত্যন্ত চমৎকারভাবে দুই দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, জাপানসহ বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু এখন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল। শেখ হাসিনার কূটনৈতিক সফলতায় বাংলাদেশ এখন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব যখন নিষেধাজ্ঞাসহ দেশের সংবিধান পরিপন্থী নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার পাঁয়তারা করছে, শেখ হাসিনা তখন দেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করার দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করে যাচ্ছেন। কোন অবস্থাতেই পশ্চিমা বিশ্ব শেখ হাসিনার এই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অবস্থান থেকে টলাতে পারছে না। ফলে ভূ-রাজনীতির সমীকরণে শেখ হাসিনাকে বিগ ফেক্টর হিসেবে গণ্য করছে বিশ্বনেতারা।

দূরদর্শী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও স্মার্ট বাংলাদেশ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল দেশে পৌঁছে দিতে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই লক্ষ্য পূরণে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১’ বাস্তবায়ন এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়তে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপ’ তৈরি করা হয়েছে। এর চারটি স্তম্ভ রয়েছে: স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট গভর্নেন্স।

বাংলাদেশ একটি দেশ তার স্থিতিস্থাপকতা এবং দ্রুত উন্নয়নের জন্য পরিচিত, এখন তার পরবর্তী মিশন শুরু করছে: একটি স্মার্ট বাংলাদেশ হওয়া। প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, এই মিশনের লক্ষ্য জাতিকে একটি ডিজিটালভাবে উন্নত, সংযুক্ত এবং টেকসই সমাজে রূপান্তর রাখতে সক্ষম।

স্মার্ট বাংলাদেশ মিশনের একটি মৌলিক স্তম্ভ হল ডিজিটাল অবকাঠামোর উন্নয়ন। এর মধ্যে রয়েছে সারা দেশে উচ্চ-গতির ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ, যাতে প্রত্যেক নাগরিকের ডিজিটাল বিশ্বে অ্যাক্সেস রয়েছে তা নিশ্চিত করা। ডিজিটাল বিভাজন দূর করার মাধ্যমে, সরকার ব্যক্তি, ব্যবসা এবং সম্প্রদায়কে ডিজিটাল

যাই হোক, স্মার্ট বাংলাদেশ মিশনের সাফল্য নির্ভর করে সরকার, বেসরকারি খাত, শিক্ষাবিদ এবং নাগরিকদের মধ্যে সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের উপর। এটি একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করার জন্য একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন যা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে, প্রযুক্তিকে আলিঙ্গন করে এবং পরিবর্তনশীল ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপের সাথে খাপ খায়।

একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার মিশন ভবিষ্যতের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মানের জন্য জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে। প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে, বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জগুলি অতিক্রম করার, উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার এবং একটি ডিজিটালি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে। ডিজিটাল অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট শহর, ই-গভর্ন্যান্স এবং উদ্যোক্তাদের উপর ফোকাস দিয়ে, বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য একটি উন্নত, স্মার্ট ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমরা কাজ করবো।

লেখক: প্রভাষক, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

কৃষি ও কৃষকের পাশে শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনে এখন প্রথমবারের মত হাঁস-মুরগী, কবুতর ও গরু পালন হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ধান, শাক-সবজি, ফুল-ফল, মধু ও মাছ চাষও হচ্ছে। আর সব কিছুর তদারক করছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণমাধ্যমে তিনি বলেছেন, দেশের প্রতিটি পরিবারকে কৃষিতে উৎসাহ দিতে তাঁর এই উদ্যোগ। তিল-সরিষার মতো পেঁয়াজের মত ফসলের চাষ করেছেন মাটি ও মানুষের কন্যা শেখ হাসিনা।

এরইমধ্যে শেখ হাসিনা দেশের প্রতি ইঞ্চি জমির সদ্ব্যবহারের আহবান জানিয়েছেন। আগেই তাঁর বিশেষ উদ্যোগ ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্পে সারাদেশে প্রায় ১ কোটি ৬৫ লাখ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

চা এলো সমতলে

সিলেট অঞ্চলের টিলায় চায়ের চাষ দেখে অভ্যস্ত বাংলাদেশের মানুষ। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর প্রথম সমতলে চা চাষের যাত্রা শুরু হয়। প্রথমে পঞ্চগড়ে। পাহাড়ি অঞ্চলের পাশাপাশি সমতল ভূমিতে চা চাষের এই যাত্রা শেখ হাসিনার কৃষি বান্ধব কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় আসার পর চা উৎপাদন শুরু হয় পঞ্চগড়ের পাশের জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে। বর্তমানে এ জেলার ১ হাজার ৪৫৭ একর জমিতে চা চাষ হচ্ছে, এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৩ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

২০২২ সালের ২৭ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ১২০ থেকে বাড়িয়ে ১৭০ টাকায় উন্নীত করেন। ভর্তুকি মূল্যে রেশন সুবিধা বাড়ানো হয়। এছাড়া চিকিৎসাসুবিধা, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পেনশন, শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, আবাসনসহ নানামুখী কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়। সবকিছু মিলিয়ে এখন তাদের দৈনিক মজুরি আসবে সাড়ে চার শ থেকে পাঁচ শ টাকার মতো ।

কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার

বর্তমান সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে দেশে কৃষি জমি চাষে ৯০%, আগাছা দমনে ৬৫%, কীটনাশক প্রয়োগে ৮০%, সেচকার্যে ৯৫% এবং ফসল মাড়াইয়ের কাজে ৭০% যান্ত্রিকীকরণ সম্ভব হয়েছে। বর্তমান সরকারের আরেকটি বড় সাফল্য হলো কৃষি গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেয়া। এর ফলে প্রতিটি কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ল্যাব উন্নয়নসহ নানামুখী গবেষণা পরিচালনা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেশে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল কৃষি তথা ‘ই-কৃষি’র প্রবর্তন করা হয়েছে । মোট ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র, কৃষি কল সেন্টার-১৬১২৩, কৃষি কমিউনিটি রেডিও, কৃষি তথ্য বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে। ফলে দেশের প্রান্তিক কৃষকসমাজ সহজেই কৃষিখাতের আধুনিকায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারছেন।

শেখ হাসিনার সরকার কৃষককে মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ করে দেওয়ায় ১ কোটি ১ লাখ ১৯ হাজার ৫৪৮টি ব্যাংক হিসাব খোলা সম্ভব হয়েছে, যেখানে বর্তমান স্থিতি প্রায় ২৮২ কোটি টাকা। দেশের মানুষ শতভাগ বিদ্যুতের আওয়ায় আসায় সেচ ব্যবস্থা নিয়মিত হয়েছে। সেচ মৌসুমে প্রান্তিক অঞ্চলে বিদ্যুতের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহে সরকারের পক্ষ থেকে মনিটরিং সেল খোলা হয়েছে।

কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি

বাংলাদেশ থেকে কৃষিপণ্যের রপ্তানি আয় ১০ বছর আগেও ছিল মাত্র ৪০ কোটি ডলার। গত ৫ বছর ধরে এই খাতে রপ্তানি বাড়ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে খাতটি ঘুরে দাঁড়ায় এবং রপ্তানি আয় ১৯ শতাংশ বাড়ে। কারণ সরকার কৃষিপণ্য রপ্তানির জন্য ২০ শতাংশ প্রণোদনা দেয়া শুরু করে। কৃষি মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পূর্বাচলে একটি অ্যাক্রিডিয়েটেড ল্যাবরেটরি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশে শাকসবজি রপ্তানি হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো- সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কাতার, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা ও নেপাল। যেসব দেশে ফল রপ্তানি হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হলো- কাতার, ভারত, ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কুয়েত, সৌদি আরব ও অস্ট্রেলিয়া।

বাংলাদেশ থেকে নানাবিধ কৃষিপণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা পাতা, আম, কাঁঠাল, লেবু, লিচু, লটকন, আমড়া, পেয়ারা। এছাড়া আলু, কচু, পটোল, মুখীকচু, লাউ, পেঁপে, শিম, করলা, কাকরুল, চিচিঙ্গা, মিষ্টি কুমড়া, গুঁড়া মসলা, কালিজিরা, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, শুকনা মরিচ, বিরিয়ানির মসলা, কারি মসলা, ড্রিংকস, বিস্কুট, চানাচুর, সেমাই, পটেটো ফ্লেকস, নুডলস, ড্রাই কেক, মুড়ি চিড়া শুকনা বরই এবং হিমায়িত সবজিও রপ্তানি হচ্ছে।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় কৃষি পেয়েছে নতুন মাত্রা

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতায় থাকায় দেশের যোগাযোগব্যবস্থায় দুর্দান্ত উন্নয়ন হয়েছে। যা কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ফসল পরিবহন সহজ হয়েছে। ফলে ক্ষৃক তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন। ২০২২ সালের ৭ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ জেলায় একযোগে ১০০ সেতু উদ্ভোধন করেন। একই বছরের ২১ ডিসেম্বর ৫০ জেলায় ১০০ সড়ক-মহাসড়ক উদ্ভোধন করেন।

কৃষিখাতে প্রণোদনা ও প্রশিক্ষণ

শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশের যুব সমাজকে কৃষিতে উৎসাহিত করতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

হয়েছে। ন্যূনতম ৮ম শ্রেণি পাশ যেকোন যুবক এ প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পেরেছেন। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক চার হাজার পাঁচশত টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্যে ৬০ হাজার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হয়। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষকদের জন্য ৩৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা নেওয়ার ১৩ বছরে সরকার কৃষি খাতে ৯৭ হাজার ৮৭৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ভর্তুকি দিয়েছে । এর মধ্যে সারে ভর্তুকি ছিল ৯৫ হাজার ১৬১ কোটি ৫ লাখ এবং বিদ্যুতে এক হাজার ৯৬২ কোটি ৫০ লাখ টাকা।

করোনা মোকাবেলায় কৃষকের পাশে সরকার

করোনা দুর্যোগে কৃষকদের পাশে ছিল শেখ হাসিনার সরকার। করোনায় শ্রমিক সংকটে থাকা কৃষকদের জমির পাকা ধান যাতে ঘরে তুলতে সমস্যা না হয়, সে জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সারাদেশে আওয়ামী লীগ ও এর সব সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা স্বেচ্ছাশ্রমে কৃষকদের ধান কাটতে সহায়তা দেন। কৃষকদের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ তহবিল থেকে সহজ শর্তে ৪ শতাংশ সুদে ঋণ নিতে পেরেছিলেন কৃষক। করোনার সময়ে সারের ভর্তুকি বাবদ ৯ হাজার কোটি টাকা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য ১০০ কোটি টাকা, বীজের জন্য ১৫০ কোটি টাকা এবং কৃষকদের জন্য আরও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশের অর্জন এবং শেখ হাসিনা

আজ থেকে চার দশক আগেও বাংলাদেশকে একটা তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে জানতো এবং চিনতো পুরো বিশ্ব। বিভিন্ন দেশ আর দাতা সংস্থার সাহায্য নিয়েই চলতো বাংলাদেশ। বিশ্ব দরবারে আমাদের পরিচিতি ছিলো হতদরিদ্র, গরিব রাষ্ট্র হিসেবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্ণতা ছিলো না। আর্থিক অবস্থা ছিলো একেবারেই দিনহীন। ছিলো না উন্নত

যোগাযোগ ব্যবস্থা। দেশি কিংবা বিদেশী বিনিয়োগের পরিবেশ সে তো অনেক দূরের বিষয়। এ কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষের কাছে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতাম না।

সেই দরিদ্র, ভঙ্গুর অর্থনীতির রাষ্ট্র বাংলাদেশের চেহারা আমূল পাল্টে গেছে গত প্রায় এক দশকেরও বেশি সময়ে। বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। সারা বিশ্বে আজ বাংলাদেশের পরিচিতি একটি উন্নয়নশীল এবং উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে। বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমের চোখে বাংলাদেশ এখন আর আগের বাংলাদেশ নেই। এটি আগামী দেড় দশক পর অর্থাৎ ২০৪০ সালে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। সে লক্ষ্যে পাল্লা দিয়ে ছুটছে প্রতিদ্বন্দ্বি দেশগুলোর দিকে। এ কারণে বিশ্বের বড় বড় দেশগুলোর চোখ এখন ৫৫ হাজার বর্গ মাইলের ব-দ্বীপের দিকে। চীন, ভারত, জাপান, সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি এখন বাংলাদেশের দিকে। এসব দেশের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশকে তাদের বিনিয়োগের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। আর এ দিক থেকে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে চীন।

এই যে মাত্র এক দশক সময়ে বাংলাদেশের চেহারাটা পাল্টে গেলো, বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশকে তাদের বিনিয়োগের উত্তম স্থান হিসেবে বেছে নিচ্ছে এবং নিলো তার নেপথ্যের কারিগর কিন্তু একজন। আপনি মানেন বা না মানেন স্বীকার করেন বা না করেন- তাতে কিছু যায় আসে না। সত্যটা হচ্ছে- গত এক দশকের বেশি সময়ে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে টেনে নিয়েছেন যিনি তিনি শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরী টানা তিনবার সহ চার বারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার হাত ধরেই আজ বিশ্ব দরবারে অনন্য উচ্চতায় বাংলাদেশ।

গত এক দশকের বেশি সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অবিস্মরণীয় উন্নতি করেছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব নেতাদের কাছে বাংলাদেশ এখন গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ এখন উদীয়মান অর্থনীতির দেশ।

যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক সামিয়িকী দি ইকোনমিষ্টের সহযোগি প্রতিষ্ঠান ‘ইকোনমিষ্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআরইইউ) ‘ এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনেও বাংলাদেশের এগিয়ে

বাংলা নামের একটা দেশ আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে চেনে। শেখ হাসিনাকে চেনে। একজন মুজিব জন্মেছিলেন বলেই আমরা সবুজ পাসপোর্ট পেয়েছিলাম। তা না হলে আমরা থাকতাম পাকিস্তানীদের বুটের তলায়। আমাদের মতো অকৃতজ্ঞও পৃথিবীতে সম্ভবত দ্বিতীয়টি নাই। যার বা যাদের জন্যই করবেন দেখবেন তারাই চোখ উল্টে ফেলবে। যেনো এটাই নিয়ম। সেটা কি সংসারে, কি রাষ্ট্রে। আমি সারাজীবন যাদের জন্য করেছি তারা কেউই সেসব মনে রাখেনি। নূন্যতম কৃতজ্ঞতাবোধও নাই। কেউ কেউ মনে করে পাওয়াটা তাদের অধিকার। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে চিনতেও কষ্ট হয়। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এমনটা দেখা যায়। যেমন শেখ হাসিনা যে এতো করছেন এই দেশের জন্য তারপরও কিছু লোকের সেটা চোখে পড়ে না। ভাল লাগে না। কৃতঘ্ন বলেই বঙ্গবন্ধুকে সপারিবারে হত্যা করতে পারে। আচ্ছা শেখ হাসিনার অপরাধটা কোথায় যে জন্য তাঁকে টেনে হিচরে ক্ষমতা থেকে নামাতে হবে!’’